এক পথে তিন যাত্রী
গান্ধী, জিন্নাহ ও মুজিব

আমাদের এই উপমহাদেশে তিনজন বড় মাপের নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল, যাঁরা তিনটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং অনুসারীদের দ্বারা জাতির পিতা উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এঁরা হলেন মোহনদাস করমচাঁন্দ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮), মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) এবং শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-৭৫)। কেবল জাতির পিতা নয়, অনুরাগীরা অন্য উপাধিও তাঁদেরকে দিয়েছে। গান্ধী ছিলেন মহাত্মা, জিন্নাহ কায়েদে আজম, শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু। তাঁদের মধ্যে সাদৃশ্য ছিল, আবার ছিল পার্থক্যও। পার্থক্য থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। কোনো দুজন মানুষই এক রকমের হন না, আর এঁরা তো কেউই সাধারণ মানুষ নন, তিনজনই অসাধারণ, একজনের সঙ্গে অপর দুজনের তুলনা চলবে না, তার প্রয়োজনও নেই, কিন্তু তাঁদের অসাধারণত্ব তাঁরাও স্বীকার করবেন যাঁরা তাঁদের সমালোচক। তিনজনের ভেতরকার ঐক্য যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি তাদের দূরত্বটাও উপেক্ষা করবার বিষয় নয়। তবে চূড়ান্ত বিচারে ঐক্যটাই বোধকরি অধিক গ্রাহ্য ও মূল্যবান দূরত্বের তুলনায়।

তিনজনই বীর ছিলেন, ছিলেন সেই সঙ্গে নেতাও। বীর মানেই যে নেতা তা নয়, যদিও নেতা মাত্রেই বীরত্বের গুণে ভূষিত থাকেন, বাইরে থেকে নয়, একেবারে ভেতর থেকে। তাঁরা সাহসী মানুষ ছিলেন, ছিলেন আপসহীন এবং দৃঢ়। মেরুদণ্ড শক্ত ছিল তিন জনেরই। ইংরেজিতে যাকে বলে ক্যারিসিমা, বাংলায় বলা যায় বিভূতি, সেটা তাঁদের ছিল। তাঁরা ডাক দিয়েছেন, পথ দেখিয়েছেন, সংগঠিত করেছেন। উদ্বুদ্ধ করেছেন মানুষকে। গান্ধী, জিন্নাহ, মুজিব তিনজনই ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। স্বপ্ন দেখতে জাতি গঠ করবেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বলা যায় একচ্ছত্র।

মিলগুলো তাই সহজেই চোখে পড়ে। গান্ধী রাজনীতিতে আসেন ১৯১৫ সালে। এসেই ভারতীয় রাজনীতিতে যেমন পরিমাণগত তেমনি গুণগত পরিবর্তন ঘটান। এতদিন রাজনীতি ছিল দালানকোঠায় আবদ্ধ, তাকে তিনি নিয়ে গেলেন, জনজীবনের একেবারে মাঝখানে। সাধারণ মানুষ তাঁর বেশভূষা, চাল-চলন ভাষা দেখে অভিভূত হয়েছে, তাঁকে গণ্য করেছে আপনজন বলে, মান্যও করেছে সেই ভাবে। তিনি অস্পৃশ্যতা ভেঙে দিতে চেয়েছেন। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টানের মধ্যে ভেদাভেদ দেখেননি। সকলকেই ভারতবর্ষীয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন। স্বাধীনতার জন্য গান্ধী আজীবন সংগ্রাম করেছেন। সত্যাগ্রহ করেছেন। উদ্ভাবন

করেছেন অহিংস অথচ দৃঢ় অসহযোগের। স্থানীয় শিল্প গড়ে তোলার জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ছিলেন তিনি বিলাসিতার বিরোধী। ইংরেজ তাঁকে ভয় করতো কিন্তু তাঁর নিজের কোনো ভয় ছিল না। গান্ধী বারবার কারাবরণ করেছেন।

আনুষ্ঠানিক অর্থে ভারতীয় কংগ্রেসের তিনি সদস্য ছিলেন না। সভাপতি হননি কখনো। অথচ কংগ্রেস চলতো তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী। পিতার মতো ছিলেন, তাঁকে বাপুজী বলা হতো। জওহরলাল নেহেরু মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল প্রখর, যোগ্যতা অবিসংবাদিত, কিন্তু নেহেরু বাপুজীর মন জুগিয়ে চলতেন, জানতেন যে বিরোধিতা করলে নিচে পড়ে যাবেন, তখন তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। গান্ধীর মন জুগিয়ে চলেননি বলে কংগ্রেসের অন্য একজন বড় মাপের নেতা, বাংলার চিত্তরঞ্জন দাশকে কংগ্রেস ছেড়ে দিয়ে নতুন দল স্বরাজ পার্টি গঠন করতে হয়েছিল। চিত্তরঞ্জনের অনুসারী সুভাষচন্দ্র বসুর বীরত্ব ও নেতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ করবে কে ? সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তাও ছিল অসামান্য। দুই দুই বার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু যেহেতু নেহেরুর মতো গান্ধীর অনুসারী হতে পারেননি, সুভাষকে তাই কংগ্রেস ছাড়তে হয়েছে। কেবল কংগ্রেস নয়, নিজের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন করবেন এমন সুযোগ অপর্যাপ্ত দেখে দেশ ছেড়েই চলে গেছেন; বিদেশ থেকে আক্রমণ করে দেশকে স্বাধীন করবেন এমন আশা বুকে নিয়ে। এমনই অপ্রতিহত ছিল গান্ধীর শান্ত কর্তৃত্ব। গান্ধী যেমন জনতার নেতা তেমনি নেতা তিনি জননেতাদেরও।

গান্ধী কথা বলতেন সাধারণ মানুষের ভাষায়। তাঁর উপস্থাপনা ছিল সহজ-সরল। আড়ম্বরের ধার ধারতেন না। বাক্য ব্যবহারে ছিলেন মিতব্যয়ী। কিন্তু তাঁর বাগ্মিতা ছিল অনন্যসাধারণ। শ্রোতার হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করতো সরাসরি।

নেতা হিসেবে জিন্নাহও ছিলেন তাঁর দলের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কেবল দল নয়, নিজের সম্প্রদায়ের ভেতরও। এক সময়ে তিনি হিন্দু-মুসলিমের মিলিত রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁকে বলা হতো হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর অগ্রদূত। ১৯০৬ সালে যখন মুসলিম লীগ গঠিত হয় তখন জিন্নাহ তাতে যোগ দেননি; কংগ্রেসের ভেতর থেকেই কাজ করছিলেন, কিন্তু পরে তিনি মুসলিম লীগের একচ্ছত্র নেতা হয়ে ওঠেন। মুসলিম লীগে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না। তিনি কেবল সভাপতি ছিলেন না, ছিলেন সিদ্ধান্তদাতা। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ডাকা হতো, কিন্তু সেসব প্রস্তাবই তাতে গৃহীত হতো যেগুলো তিনি পছন্দ করতেন। ১৯৪০ সালে লীগের প্রকাশ্য কাউন্সিল সভায় গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে ব্রিটিশমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানানো হয়েছিল; পরে জিন্নাহর ইচ্ছায় সেই প্রস্তাবের শব্দ বদলে একটি রাষ্ট্রের কথা লেখা হয়েছে। প্রস্তাবটি তিনি উত্থাপন করিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হককে উপাধি দিয়েছিল 'শেরেবাংলা'। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন এই আশঙ্কায় জিন্নাহ পরে

এমন অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন যে শেরেবাংলা লীগ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। গান্ধীর হাতে সুভাষ বসুর যে দশা হয়েছিল জিন্নাহর হাতে ফজলুল হকের পরিণতি তা থেকে ভিন্ন হয়েছিল এমনটা বলা যাবে না। বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহর অনুগত ছিলেন, কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেননি, অধিকতর নিরাপদ খাজা নাজিমুদ্দীনকে পেয়ে জিন্নাহ তাঁর পছন্দ প্রত্যাহার করে নিয়ে নাজিমুদ্দীনকেই সাতচল্লিশ-পরবর্তী পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর পদ দিয়েছেন। আবুল হাশিমকেও জিন্নাহ রেখেছিলেন কোণঠাসা করে।

জিন্নাহ কথা বলতেন উর্দুতে নয়, ইংরেজিতেই। বক্তৃতাও করতেন ওই ভাষাতেই। কিন্তু তাঁর বাগ্মিতাও ছিল অসামান্য। উদ্দীপ্ত করতেন, যুক্তি দিতেন, উদ্বুদ্ধ করে তুলতেন। তাঁর নেতৃত্বেই মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান, বলতে গেলে একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কর্মে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। সংগঠনকে তিনি সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। গান্ধীর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের ভেতরে ছিল না বটে, তবে বাইরে একজন ছিলেন, তাঁর নাম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

শেখ মুজিবুর রহমান সর্বভারতীয় রাজনীতি করেননি, তাঁর সময়টা ছিল ভিন্ন, ক্ষেত্রও স্বতন্ত্র; কিন্তু তাঁর সময়ে অর্থাৎ পাকিস্তানের রাজনীতিতে শেষ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বলতেও কেবল একজনই ছিলেন, জুলফিকার আলী ভুট্টো, অন্যরা পিছিয়ে পড়েছেন, সময়ের স্রোতে হারিয়ে গেছেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও অসাধারণ মাপের মানুষ ছিলেন, নেতা ছিলেন অনেক বড়, ছিলেন অনমনীয় বীর। পূর্ববঙ্গের রাজনীতিতে মুজিবের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা ঘটে মওলানার সমর্থনেই। কিন্তু মওলানা নিজের গড়া আওয়ামী লীগকে ধরে রাখতে পারেননি, তাঁর নির্ভরতা ছিল যে বামপন্থীদের ওপর তাঁদের নেতৃত্ব যথেষ্ট ধীশক্তিসম্পন্ন ছিল না বলে। যে জন্য আওয়ামী লীগ চলে গিয়েছে মুজিবের হাতে, কালে মুজিব ওই দলের সভাপতি হয়েছেন। কেবল সভাপতি নন, এককালে মুসলিম লীগে জিন্নাহর যে স্থান ছিল মুজিবের কালে মুজিবের স্থান তার চেয়ে নিচে ছিল না। তিনিও একচ্ছত্র ছিলেন। তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ীই তাঁর দল চলতো। আর সাংগঠনিক ক্ষমতায়ও তাঁর তুলনা পাওয়া কঠিন।

মুজিব কথা বলতেন পূর্ববঙ্গের নিজস্ব ভাষায়। গান্ধীর ভাষাও ছিল অকৃত্রিম, কিন্তু গান্ধীর বক্তব্যে তত্ত্বও থাকতো; মুজিব ব্যবহার করতেন কাজের ভাষা, বলতেন কাজের কথা, তত্ত্বে তাঁর আগ্রহ দেখা যায় নি। গান্ধী 'আপ' অর্থাৎ আপনি বলে অপরকে সম্বোধন করতেন, মুজিব তাঁর আপনজনকে তুমি-তুই বলে ডাকতেন– এতটাই অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠতো নেতা ও কর্মীদের মাঝে। গান্ধীর কাছে 'তুই' ছিলেন ভগবান; মুজিবের কাছে 'তুই' ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ কর্মী বাহিনী। গান্ধী ও জিন্নাহর মতো মুজিবের বাগ্মিতাও ছিল অনন্যসাধারণ। উদ্দীপক। তাঁদের মতোই তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী এবং আপোসহীন।

কিন্তু পৃথিবীতে কোনো দুজন মানুষই যখন এ রকমের নন, তখন এই তিনজন বড় মাপের মানুষইবা স্বতন্ত্র হবেন না কেন ? অনেক দিক দিয়েই তাঁরা পৃথক ও দূরবর্তী ছিলেন একে অপরের।

গান্ধী ও জিন্নাহ একই এলাকা থেকে এসেছেন, দুজনেই ছিলেন গুজরাটের; উভয়ের পরিবারই ছিল ধনাঢ্য, এতটা ধনী যে সন্তানকে পাঠাতে পেরেছিল বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে। গান্ধী ও জিন্নাহ উভয়েই ব্যারিস্টার ছিলেন। জিন্নাহর খুব প্রতিপত্তি ছিল আইনজীবী হিসেবে, গান্ধীরও প্রতিপত্তি অসামান্য হতো, যদি তিনি ওই পেশায় থাকতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকার সময় কিছুদিন ওকালতি করেছেন, কিন্তু ভারতবর্ষে যখন এলেন তখন সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ হিসেবেই এসেছেন এবং সেখানে, রাজনীতিতে, তাঁরা গান্ধী ও জিন্নাহ একজন অপরজনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালেন। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, শেষ দিকে এঁরা একে-অপরকে সহ্য করতে পারতেন না। কংগ্রেস ও লীগের যে উত্তর মেরু-দক্ষিণ মেরু সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তার পেছনে এই দুই নেতার ব্যক্তিগত রেষারেষির যে একটা ভূমিকা ছিল সেটা মানতেই হবে। কংগ্রেসে গান্ধী ছিলেন অবিসংবাদিত; জিন্নাহ দেখেছেন সেখানে তাঁর জন্য এমনকি একটি সম্মানজনক অবস্থান বের করাও কঠিন; ত্যক্তবিরক্ত হয়ে এক সময়ে তিনি দেশত্যাগ করেই চলে গেছেন। তবে সুভাষ বসুর মতো নয়, দেশকে মুক্ত করবেন এমন স্বপ্ন নিয়ে নয়, বিলেতে আইনব্যবসাতে নিযুক্ত হয়ে জীবন কাটাবেন এই রকমের অভিপ্রায় নিয়ে। এক সময়ে, ১৯৩৪-এ ফিরে এসেছেন, তবে কংগ্রেসের নেতা হিসেবে নয়, মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দিতে।

তখন থেকেই তাঁর রাজনীতি আলাদা হয়ে গেছে গান্ধীর রাজনীতি থেকে। কেবল আলাদা নয়, প্রতিদ্বন্দ্বী। গান্ধী সারা ভারতের নেতা থাকতে চেয়েছেন, জিন্নাহ সেটা হতে দেননি; মুসলমানদের আলাদা করে দিয়ে, ভারতবর্ষ এক জাতির দেম নয়, এখানে জাতি একটি না দুটি, হিন্দু ও মুসলমান, এই রাজনৈতিক ধ্বনি তুলে গান্ধীকে তিনি শেষ পর্যন্ত হিন্দু ভারতের নেতৃত্বের জায়গায় ঠেলে দিলেন, নিজে তুলে নিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের একক নেতৃত্ব।

গান্ধী ও জিন্নাহর মধ্যকার বিরাট ব্যবধান যত সুন্দরভাবে তাঁদের ব্যক্তিগত পোশাকের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ততটা বোধ করি অন্য কিছুতে পায়নি। ওই পোশাক কেবল পোশাকি নয়, যেন প্রতীকীও বটে। গান্ধীর পোশাক গরিব মানুষের, জিন্নাহর পোশাক সাহেবী। দু'জনের বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার, কিন্তু গান্ধীর জামা-কাপড় বলতে যা গায়ে রাখতেন তা ছিল অতি সামান্য। তিনি জনগণের একজন হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে চান, যে জনগণের বেশির ভাগ গরিব ও হিন্দু। জিন্নাহর জামা কাপড় জানিয়ে দিচ্ছে যে, তিনি খাঁটি বুর্জোয়া; জনগণের একজন হিসেবে নিজেকে হাজির করবেন এমন চেষ্টা তার জন্য বোধ করি

ছিল কষ্টকর ও অপচয়মূল। শেষ পর্যন্ত জিন্নাহ অবশ্য শেরওয়ানি-পায়জামা ও টুপি পরেছেন, কিন্তু সেটা একেবারেই শেষ অধ্যায়ে, এবং ওই জামা কাপড়ও যে গরিব মানুষের মতোন ছিল তা মোটেই নয়, ছিল তা বড়লোকেরই।

জিন্নাহর গায়ের পোশাক যেমন মুখের ভাষাও তেমনি– সাধারণ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব জ্ঞাপক। কথা বলতেন ইংরেজিতে, বক্তৃতাও করতেন ওই ভাষাতেই, ঠিক যেভাবে তাঁর গায়ে থাকতো ইংরেজদের মতো জামা-কাপড়। রাজনীতি করেছেন, আন্দোলনেও ছিলেন; কিন্তু তাঁর পদ্ধতিটা ছিল আইনজীবীর, আবেগকে প্রশ্রয় দিতেন না। যুক্তি গান্ধীও দিয়েছেন, তর্ক করেছেন, তত্ত্ব এনেছেন কিন্তু তাঁর রাজনীতিতে আবেগ অগ্রাহ্য ছিল না। জিন্নাহ মুসলমানদের নিয়ে রাজনীতি করেছেন, কিন্তু ধর্মে তাঁর মোটেই আগ্রহ ছিল না, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল তা নয়। ১৯৪৭-এর চৌদ্দই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন; ওই দিনটি ছিল রোজার মাসের অন্তর্ভুক্ত, সেদিন করাচিতে অবিভক্ত ভারতবর্ষের শেষ গভর্ণর জেনারেল মাউন্টবেটেনের সম্মানে জিন্নাহ মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেছিলেন। পরে অবশ্য সেটিকে রাতের অনুষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছিল, কিন্তু কখন রোজা কখন আসে কখন যায় সেটা যে তাঁর খেয়ালে ছিল না তা সত্য। খাদ্যাভ্যাসেও তিনি ধর্মীয় অনুশাসন মানতেন বলে জানা যায় না।

আসলে দ্বিজাতিতত্ত্বের রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করলেও জিন্নাহ ছিলেন পরিপূর্ণরূপে ইহজাগতিক, ধর্ম ও রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলাটা তাঁর রুচিতে ছিল না, যদিও ঘটনাক্রমে মিশিয়ে ফেলতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। কাজটার সংশোধনের চেষ্টা তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই করেছিলেন; পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনেই তিনি বলেছেন যে, নতুন রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অর্থে কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান থাকবে না, সবাই হবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক। এর আগেও পাকিস্তানকে তিনি মোল্লাতন্ত্র হিসেবে কল্পনা করেননি, দেখতে চেয়েছেন একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবেই।

ঠিক উল্টোটা ঘটেছে গান্ধীর ক্ষেত্রে। গান্ধী ছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, তিনি সকল ধর্মাবলম্বী মানুষকেই ভারতীয় মনে করতেন, তাঁর কাছে ঈশ্বর এক ও অভিন্ন, ঈশ্বরের প্রকাশটাই শুধু ভিন্ন ভিন্ন বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে তিনি মোটেই ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না। ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করা তাঁর জন্য ছিল নীতিবিগর্হিত কাজ। তাই দেখি তিনি প্রার্থনা সভার আয়োজন করছেন এবং সেই সভাতে রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। স্মরণীয় যে, গান্ধী নিহত হয়েছেন ওই রকম একটি প্রার্থনা সভাতেই। জিন্নাহ প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছেন এমনটা কল্পনা করা কঠিন। গান্ধী অনশন করতেন, বারবার জেলে গেছেন, জিন্নাহ অনশন করবেন বলে কখনো ভাবেননি, তাঁর রাজনীতিতে কারাবন্দি হবার ব্যাপারটাও ছিল না; ইংরেজরা বরঞ্চ গান্ধীর তুলনায় তাকেই অধিক পছন্দ করতো। গান্ধী ছিলেন আমলাতন্ত্রের বাইরে এবং আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তাঁর

রামরাজ্যে আমলাতন্ত্রের অস্তিত্বই থাকবার কথা নয়। কিন্তু জিন্নাহ ছিলেন অসংশোধনীয় রূপে আমলাতান্ত্রিক। মুসলিম লীগের তিনি সভাপতি, নিজের গড়া নতুন রাষ্ট্রের তিনি প্রথম গভর্নর জেনারেল। উভয় নেতাই ছিলেন; কিন্তু গান্ধী শেষমেশ ভারত বিভাগকে মেনে নিয়েছিলেন। জিন্নাহ তাঁর দাবি ছাড়েন নি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে তবে ক্ষান্ত হয়েছেন, যদিও প্রতিষ্ঠার পরপরই তাঁর মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল যে, হিন্দু-মুসলিম বিরোধের সমস্যা পাকিস্তান গড়ার মধ্য দিয়ে সমাধান হলো কিনা।

শেখ মুজিব এঁদের দুজন থেকেই বেশ দূরের মানুষ। সময়, স্থান এবং শ্রেণী বিশেষ করে এই তিন বিচারে। ১৯৪৮-এ যখন গান্ধী ও জিন্নাহ উভয়েই মারা যান, মুজিবের বয়স তখন মাত্র ২৮। তাঁর রাজনীতির সূচনা আগে ঘটলেও, গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ ভারত বিভাগের পরেই, যখন গান্ধী নেই, জিন্নাহ নেই। ছাত্রজীবনে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, সেই হিসেবে জিন্নাহর অনুসারী এবং গান্ধীর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। কিন্তু পরে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে জিন্নাহর পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এবং ওই বিরোধিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে ডাক দিতে হয়েছে অহিংস অসহযোগের, যেটি ছিল গান্ধীর পথ। বলাবাহুল্য, বর্বর রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে গান্ধীর অসহযোগ যেমন কার্যকর হয়নি, মুজিবের অসহযোগও তেমনি ব্যর্থ হয়েছে।

মুজিব এসেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে। একাধারে তিনি বাঙালী ও মুসলমান, যা তাঁর পোশাকে প্রতিফলিত। এ ব্যাপারে তিনি না ছিলেন গান্ধীর মতো সংক্ষিপ্ত, না জিন্নাহর মতো সুসজ্জিত; তিনি নিরে জন্য যে পোশাক তৈরি করে নিয়েছিলেন তা স্বচ্ছন্দরূপে মধ্যবর্তী এবং লক্ষণীয়রূপে স্থানীয়। মুজিব যে গান্ধী, জিন্নাহ এমনকি তাঁর প্রিয় নেতা সোহরাওয়ার্দীর মতোও ব্যারিস্টার হবেন না সেটা ছিল সুনির্দিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত। প্রান্তবর্তী ও কোণঠাসা পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত এলাকা ফরিদপুর থেকে তিনি এসেনে; রাজধানী কলকাতায় তিনি থাকতেন হোস্টেলে, পরবর্তী রাজধানী ঢাকায় তাঁকে থাকতে হতো ঘর ভাড়া করে। বিএ পাস করেছিলেন, আইনে ভর্তি হয়েছিলেন, কিন্তু এগোননি। সর্বপাকিস্তানি নেতৃত্বের চাইতে আঞ্চলিক রাজনীতির দিকেই তাঁর ছিল স্বাভাবিক ঝোঁক। নিজের দলের যখন তিনি সভাপতি তখন সেখানে তিনি একচ্ছত্র। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী হবার ইচ্ছাও কারো ছিল না; কেননা পথটা ছিল বিপজ্জনক। গান্ধী জেল খেটেছেন, জিন্নাহ ওপথ মাড়ান নি, মুজিবকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছে ঘন ঘন, অনশনও করেছেন জেলখানায় এবং শেষ পর্যন্ত অভিযুক্ত হয়েছেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায়; একবার নয় দু'বার; এবং প্রতিবারই আশঙ্কা ছিল প্রাণদণ্ডাদেশের। তাঁর আওয়ামী লীগে তিনিই সিদ্ধান্ত নিতেন, কি সিদ্ধান্ত হবে অনেক সময়ে অন্যরা তা আঁচ করতেও ব্যর্থ হতো।

গান্ধী এবং জিন্নাহ উভয়েই রাজনীতিতে এসেছেন পরিণত বয়সে, মুজিব যোগ দিয়েছেন ছাত্রজীবনেই। অসামান্য সাংগঠনিক শক্তি ছিল তাঁর। সাহসেও ছিলেন অতুলনীয়। বাগ্মিতায় অসাধারণ, গান্ধী ও জিন্নাহর মতোই। গান্ধীর মতো ধীরে

ধীরে কথা বলতে না, ছিলেন বরঞ্চ জিন্নাহর মতো জলদগম্ভীর; কিন্তু ভাষা ছিল দেহাতী মানুষের, যেমনটা ছিল গান্ধীর ভাষা। জিন্নাহর মতো মুজিবও উচ্চপদ পছন্দ করতেন, গান্ধী যা থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসতেন। মুজিবকে দেখি অল্প বয়সে মন্ত্রী হচ্ছেন, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে প্রথমে সে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। পরে রাষ্ট্রপতি হয়ে বসলেন এবং এক পর্যায়ে অন্যসব রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করে দিলেন। পিতৃতান্ত্রিক একনায়কত্বের ব্যাপারটা আসলে তিনজনের মধ্যেই ছিল, তবে প্রকাশ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। গান্ধীর ভেতর যার প্রকাশ অত্যন্ত শান্ত ও নিরীহ, জিন্নাহ ও মুজিবের মধ্যে তা ছিল বর্জনির্ঘোষসম। স্মরণীয় যে, জিন্নাহ ও মুজিব দুজনেই মুসলিম লীগে ছিলেন; মুজিবের আওয়ামী লীগ প্রথমে ছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ, পরে হয়েছে শুধু আওয়ামী লীগ, কিন্তু নামের অভিধা পরিত্যাগ করতে পারেননি।

উত্তর ভারতীয় গান্ধী ও জিন্নাহ উভয়েই দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন, গান্ধী বেঁচেছিলেন ৭৯ বছর, জিন্নাহ ৭২। মুজিবের জীবনকাল সে-তুলনায় ছিল সীমিত; তিনি নিহত হন মাত্র ৫৫ বছর বয়সে। কিন্তু তাই বলে তাঁর রাজনৈতিক জীবন কম ঘটনাবহুল ছিল না; গান্ধীর তুলনায় না হলেও জিন্নাহর তুলনায় অবশ্যই বেশি।

৩

তাঁদের ঐক্যের দিকটা আবার লক্ষ্য করা যাক। ঐক্যটাই বরঞ্চ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ, পার্থক্যের তুলনায়। তিনজনই ছিলেন স্বপ্নদ্রষ্টা। তাদের লক্ষ্য ছিল জাতিগঠনের। গান্ধী চেয়েছিলেন সকল ভারতবর্ষীয় মানুষকে নিয়ে একটি জাতি গঠন করবেন। সেটা সম্ভব হয়নি, গড়তে গিয়ে বরঞ্চ দেখেছেন হিন্দু-মুসলিম বিরোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। জিন্নাহ চেয়েছিলেন একটি নতুন জাতির প্রতিষ্ঠা ঘটাবেন, যেটা হবে পাকিস্তানি জাতি। পারেননি, রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে বাঙালীরা প্রথমে বিদ্রোহ করেছে এবং পরে স্বাধীন হয়ে গেছে। মুজিব বাঙালীর নেতা হতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না, কেননা সব বাঙালী পূর্ববঙ্গে থাকে না; তার চেয়েও বড় কথা বাঙালী কোনোদিন নতুন জাতি নয়, পুরাতন বটে।

কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই তিন নেতাই যুক্ত ছিলেন। গান্ধীর নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত, জিন্নাহর নেতৃত্বে স্বাধীন পাকিস্তান এবং মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জিত হয়েছে। তবে তাঁরা কেউই তাঁদের অর্জিত রাষ্ট্র নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। গান্ধীর জন্য ভারত বিভাগ ছিল মর্মান্তিক,তাঁর দেহকে বিভক্ত না করে ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করা যাবে না বলে তিনি বলেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিভাজন তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে। কেবল তাই নয়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভেতর দিয়ে গান্ধী তাতে মর্মাহত হয়েছিলেন; সংখ্যালঘুদেরকে রক্ষা করবার জন্য তিনি অনশন করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে হিন্দু নন এমন সন্দেহে ঘোরতর হিন্দু আততায়ীর গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। জিন্নাহ যে

পাকিস্তান চেয়েছিলেন সেটা তিনি পাননি, পেয়েছেন খণ্ডিত রূপে যাকে তিনি বলেছিলেন 'কীটদষ্ট' পাকিস্তান। মুজিব যে বাংলাদেশ শেষ পর্যন্ত পেলেন সেটা ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ও বেদনায় রঞ্জিত এবং যুদ্ধের কারণে বিধ্বস্ত ও বিশৃঙ্খল। গান্ধী প্রাণ হারান স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই; জিন্নাহও চলে যান ওই একই বছরে, ১৯৪৮-এ।

জিন্নাহ অবশ্য গুপ্তঘাতকের গুলিতে নিহত হননি, যেমনটি পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি যে রাষ্ট্রীয় অবজ্ঞার ভেতরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সেটা মিথ্যা নয়। ঘাতকদের হাতে শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন ১৯৭৫-এ। এর কিছুদিন পরে তাঁর চারজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীকেও হত্যা করা হয়েছে কারাগারে।

তাই লক্ষ্য যে পরিপূর্ণরূপে অর্জিত হয়েছে এমনটা বলা যাবে না, কিন্তু আদর্শ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গান্ধী, জিন্নাহ ও মুজিব তিন জনই সফল হয়েছেন এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বাইরে বহুবিধ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আদর্শের এলাকাটিতে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। আদর্শ বলতে কেবল লক্ষ্যের কথা বলছি না, আদর্শ লক্ষ্যকেও ছাড়িয়ে গেছে।

এ আদর্শটা কি ? স্থূল ভাষায় বলতে গেলে এটি ছিল পুঁজিবাদী। আর এই আদর্শের কর্তব্য ছিল সামাজিক বিপ্লবকে প্রতিহত করা।

তিনজনই পুঁজিবাদী ছিলেন। জিন্নাহ যে পুঁজিবাদী ছিলেন সে বিষয়ে তো কোনো রাখঢাক ছিল না। তিনি একটি আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন; আধুনিক অর্থ তাঁর কাছে ছিল পুঁজিবাদী। তিনি গরিব মানুষের কথা যে বলেননি তা নয়; গরিবকে বলেছেন ধনী হতে, কিন্তু তারা কি করে ধনী হবে সেই পথ বাতলে দেননি। আসলে স্বার্থ দেখেছেন তিনি পুঁজিপতিদের। তিনি এসেছেন ব্যবসায়ী পরিবার থেকে, নিজে বিত্তবান ছিলেন, আশা করতেন তাঁর রাষ্ট্রে অন্যরাও বিত্তবান হবে। কিন্তু একজন বিত্তবান হতে গেলে যে নয়জনকে বিত্তহীন হতে হবে, বিদ্যমান ব্যবস্থার এই আয়োজনকে তিনি দেখতে পাননি, ভীষণভাবে যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও পাননি। তিনি একটি আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্রিটেশের রাষ্ট্রও ওই রকমই ছিল। তফাৎ এই যে, এই নতুন রাষ্ট্রের শাসকরা ছিলেন মুসলমান, আর এর আয়তন ছিল পুরাতন রাষ্ট্রটির তুলনায় অনেক ছোট। জিন্নাহ নিজেও আমলাতান্ত্রিক ছিলেন এবং তাঁর রাষ্ট্রে আমলারাই প্রকৃত শাসক হয়েছেন, প্রথমে অসামরিক আমলারা, পরে সামরিক আমলারা। বারবার সেখানে সামরিক শাসন এসেছে। এই মুহূর্তেও সেই শাসনই প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু গান্ধীকে কী পুঁজিবাদী বলা যাবে ? তিনি তো আধুনিক রাষ্ট্র চাননি; চেয়েছেন রামরাজ্য, যেটির হবার কথা প্রাক-পুঁজিবাদী। কিন্তু জ্ঞাতে হোক আর অজ্ঞাতেই হোক, গান্ধীও আসলে পুঁজিবাদী আদর্শেই বিশ্বাস করতেন। তিনি

শিল্পায়ন চাননি বলে মনে হয়েছে, কিন্তু তাঁর বিদেশী পণ্য বর্জন আন্দোলন স্বদেশী শিল্পের বিকাশকে সাহায্য করেছে। বিড়লা, টাটা, ডালমিয়ারা যে গান্ধীভক্ত ছিলেন সেটা বিনা স্বার্থে নয়, গান্ধী তাদের স্বার্থকে সাহায্য করছিলেন বলেই ওই ভক্তি অমন প্রবল হয়েছিল। তাঁর নিজের শহর আহমেদাবাদকে তিনি ভারতের ম্যানচেষ্টার হিসেবে গড়ে ওঠার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন, ম্যানচেস্টারের উৎপাদিত বস্ত্রকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার জন্য ভারতবর্ষীয়দেরকে প্রবল বেগে আহবান জানিয়ে।

তার চেয়েও বড় কথা যেটা তা হলো এই যে, গান্ধী শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সংঘর্ষকে যদিও তেমনভাবেই অগ্রহণযোগ্য মনে করতেন যেমনভাবে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে, তথাপি তিনি শ্রেণী বিভাজন তুলে দিতে চাননি। তাঁর রামরাজ্যে শ্রেণীবিদ্বেষ থাকবে না বটে, কিন্তু সেখানে শ্রেণী ঠিকই থাকবে। শ্রেণীহীন সমাজে বিশ্বাস করেন বলে তিনি কখনোই জানাননি; বরঞ্চ শ্রেণীব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ন রেখেই সামাজিক সংস্কার চেয়েছেন। যার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই যে, তিনি সামাজিক বিপ্লবকে তো অনুমোদন দেনইনি, উল্টো সেই বিপ্লবকে প্রতিহত করতে চেয়েছেন। গান্ধী কৃষকের কথা, শ্রমিকের কথা আলাদা করে ভাবেননি, অথচ সাধারণ মানুষের নেতা হিসেবে তাঁর যে আবির্ভাব তাতে ওই ভাবনার প্রয়োজন ছিল। সমাজে ধনীও থাকবে গরিবও থাকবে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা থাকবে কার্যকর– এই বক্তব্য পুঁজিবাদী আদর্শের সঙ্গে কেবল যে সঙ্গতিপূর্ণ তা নয়, ওই আদর্শের অন্তর্গতও বটে। সামাজিক বিপ্লবকে প্রতিহত করবার উদ্যোগ নিয়ে গান্ধী পুঁজিবাদী আদর্শের প্রতিই তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। ওই আনুগত্য যে কেমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটাতে পারে তার প্রমাণ এই যে, ধর্মব্যবসায়ী পুঁজিবাদীরা তাঁর মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরেও ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও রাজনীতি থেকে উৎখাত করে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আগের মতোই তৎপর হয়েছে। গান্ধীকে হত্যা করতে যাদের হাত কাঁপে না, গুজরাটের নিরীহ মুসলমান হত্যা করতে তারা ভয় পাবে কেন ? পায়নি। বর্তমান ভারত-পাকিস্তানের তুলনায় কম আমলাতান্ত্রিক হয়তো, কিন্তু তাই বলে যে কম পুঁজিবাদী তা মোটেই নয়। গান্ধী নিজেকে সাধারণ মানুষের নেতা মনে করতেন, কিন্তু যে আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কাজ করেছিলেন তাতে পুঁজি ও জমির মালিকদেরই সুবিধা হয়েছে, গরিব মানুষের বিপরীতে। জিন্নাহর সঙ্গে তাঁর অনেক ব্যবধানের অন্তরালে আদর্শিক নৈকট্য ছিল। তাঁদের মধ্যে ঝগড়ার একটা কারণ এটাও যে জিন্নাহ যখন স্বার্থ দেখছিলেন মুসলমান পুঁজিপতিদের গান্ধী তখন আকূল্য দিচ্ছিলেন পুঁজি ও জমির হিন্দু মালিকদের। ভারত বিভাগের আসল কারন গান্ধীর সঙ্গে জিন্নাহর ব্যক্তিগত বিরোধ যতটা নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি হলো দুই দিকের দুই ধনিক শ্রেণীর মধ্যকার স্বার্থগত বিরোধ।

গান্ধী ও জিন্নাহ থেকে শেখ মুজিবকে অনেক দূরের ঠিকই, কিন্তু আদর্শিকভাবে তিনিও ওই একই পুঁজিবাদী পথেরই যাত্রী ছিলেন। গান্ধী যেমন লেনিন কিংবা মাও সে তুং ছিলেন না, মুজিবও তেমন ছিলেন না ফিদেল ক্যাস্ট্রো। সমাজতন্ত্রের কথা তিনি বলেছেন বটে তবে নিতান্ত বাধ্য হয়ে। তাঁর বিপ্লব ছিল বাংলাদেশকে স্বাধীন করা। সেইভাবে স্বাধীন করা যেভাবে গান্ধী চেয়েছিলেন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে। অর্থাৎ নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটবে, কিন্তু রাষ্ট্রের চরিত্র বদলাবে না, রাষ্ট্র থাকবে আগের মতোই পুঁজিবাদী। বস্তুত বাংলাদেশে সেটাই ঘটেছে। বাঙালী উঠতি ধনীরা মুজিবের ভক্ত হয়েছিল নিজেদের স্বার্থে, যখন দেখা গেলো মুজিব তাদের স্বার্থকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক রক্ষা করতে পারছেন না, তারা তখন তাকে সরিয়ে দিয়ে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্যদের জন্য পথ পরিষ্কার কর দিয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে বামপন্থীদের সঙ্গে যতই ওঠাবসা থাক, আদর্শগতভাবে মুজিব তাঁর নেতা সোহরাওয়ার্দীর চাইতে কম সমাজতন্ত্রবিরোধী ছিলেন না। ভাসানীর সঙ্গে তাঁর আদর্শগত বিরোধটা সামান্য ছিল না, আওয়ামী লীগ থেকে বামপন্থীদের হটিয়ে দিয়ে দলকে পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির একনিষ্ঠ সমর্থক সোহরাওয়ার্দীর কুক্ষিগত করার ব্যাপারে মুজিবের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসূ। পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে তিনিই যে কমিউনিস্টদের শেষ ভরসা এটা তিনি আমেরিকানদের বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু আমেরিকানরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে সমর্থন করতে পারেনি এই আশঙ্কায় যে, আন্দোলন তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন না, সেটা বামপন্থীদের হাতে চলে যাবে। একাত্তরের যুদ্ধ যে দ্রুত শেষ হয়েছে এবং মুজিব ফিরে এসে নতুন রাষ্ট্রের প্রধান হতে পেরেছেন তার পেছনে পুঁজিবাদীদের মনে বামপন্থীরে আধিপত্য লাভের শঙ্কা যে কার্যকর ছিল তাতে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে মুজিব যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন সেটা সমাজবিপ্লব ঘটাবার উদ্দেশ্যে নয়, জনগণকে আশ্বস্ত রেখে সমাজবিপ্লবকে প্রতিহত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর কাছে রাজাকাররা প্রধান শত্রু ছিল না, প্রধান শত্রু ছিল নকশালপন্থীরা, যাদেরকে দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশ তিনি জারি করেছিলেন। বামপন্থী নেতা সিরাজ সিকদারকে বন্দি অবস্থায় হত্যা করার কাজটি তাঁর অসম্মতিতে ঘটেছে এটা হতেই পারে না। সমাজে শ্রেণীবিন্যাস আগের মতোই রেখে ধনীদের তিনি সুযোগ করে দিয়েছিলেন লুটপাট করে আরও ধনী হবার। রক্ষী বাহিনীকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন বামপন্থী উচ্ছেদের।

উপমহাদেশের এই তিন নেতাই কমিউনিস্টবিরোধী ছিলেন। গান্ধীর রাজনৈতিক কর্ম-এলাকায় কমিউনিস্টরা কোনো হুমকি হয়ে দেখা দেয়নি। নেহেরু সমাজতন্ত্রের দিকে ঝোঁকা ছিলেন বলে মনে হতো; কিন্তু নেহেরুকে গান্ধী সমাজতন্ত্র ভুলিয়ে বিশ্বস্ত কংগ্রেসিতে পরিণত করেছিলেন: ভুলাবার ক্ষমতা গান্ধী রাখতেন। জনগণকে রামরাজ্যের দিকেধাবিত করে তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক আকাঙক্ষা জেগে ওঠার সম্ভাবনা গোড়া কেটে দিতে তিনি তৎপর ছিলেন। আর

নেহেরু প্রধানমন্ত্রী হয়ে কমিউনিস্টদেরকে যেভাবে নিগৃহীত করেছেন তেমনভাবে ঔপনিবেশিক ইংরেজও ওই কাজটি করেনি।

জিন্নাহর পাকিস্তানে কমিউনিস্টরা দৃশ্যমান কোনো শক্তি হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তার আদর্শে দীক্ষিত ওই রাষ্ট্রে পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসকে প্রকাশ্যে কাজ করতে দেয়া হয়েছে, কমিউনিস্টদের দেয়া হয়নি, তাদের পার্টিকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা সমাধান পাওয়া যাবে– এই ভ্রান্ত আশার বশবর্তী হয়ে কমিউনিস্টরা পাকিস্তান দাবিকে সমর্থন পর্যন্ত করেছিল; কিন্তু পাকিস্তানে কমিউনিজমের যে কোনো স্থান হবে না জিন্নাহপন্থীরা শুরুতেই তা জানিয়ে দিয়েছে এবং যার গায়ে কমিউনিজমের গন্ধ পেয়েছে তাকেই অত্যন্ত দ্রুত গতিতে আটক করে কারাবন্দি করেছে। বহু কমিউনিস্ট দেশ ছেড়ে চলে গেছে, যারা ছিল তারা হয় আত্মগোপন করেছে নয়তো সময় কাটাতে বাধ্য হয়েছে জেলখানাতে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জিন্নাহ রাষ্ট্রবিরোধীদের হাত দেখতে পেয়েছিলেন; রাষ্ট্রবিরোধী বলতে তখন হয়তো তিনি হিন্দুদের বুঝিয়েছেন; আর কিছুকাল পরে হলে তিনি কমিউনিস্টদের হাত দেখতে পেতেন। তা কমিউনিস্টরা ছিল বৈকি; রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তো ছিল বামপন্থীদেরই আন্দোলন।

জিন্নাহর পাকিস্তানে মুজিব নির্যাতন সহ্য করেছেন। সেই পাকিস্তানে তিনি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়াই করেছেন; পরে বুঝেছেন যে সেখানে বাঙালীর মুক্তি নেই। যুদ্ধে সরাসরি উপস্থিত না থাকলেও যুদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে। কিন্তু আদর্শগতভাবে তিনিও জিন্নাহর মতো পুঁজিবাদীই ছিলেন; তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না সমাজবিপ্লবের জন্য কাজ করা, তিনি তা করেনও নি। তিনি নেতা হিসেবে বড়, কিন্তু তিনি মোটেই মওলানা ভাসানী নন। স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের কথা মওলানাই প্রথমে বলেন, কিন্তু মওলানার সেই রাষ্ট্র আর মুজিবের সোনার বাংলা এক ছিল না, এক হবার কোনো উপায়ই ছিল না।

৪

গান্ধী জিন্নাহ এবং মুজিব- তিনজনই ছিলেন তাঁদের স্থান, সময় ও শ্রেণীর প্রতিনিধি। অন্যদের তাঁরা ছাপিয়ে উঠেছেন মনীষা ও অঙ্গীকারে, কিন্তু নিজেরা লঙ্ঘন করতে পারেননি শ্রেণীর বন্ধন। গান্ধী ও জিন্নাহ এসেছিলেন বিত্তবান পরিবার থেকে; শেখ মুজিব নিম্নমধ্যবিত্তও বিত্তবানদের মতোই ছিল সমাজবিপ্লব বিরোধী। তার কারণ চিন্তার পরিধি। পুঁজিবাদের বাইরে ও বিপরীতে যে অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব এটা ওই তিনজনের কেউই ভাবেননি। ভাববার মতো দার্শনিক পরিমণ্ডল তাঁদের ছিল না, তাঁরা নিজেরাও যতটা কর্মবীর ছিলেন ততটা চিন্তাবীর ছিলেন না।

তত্ত্বচিন্তা গান্ধী যে করেননি তা নয়; করেছেন। তিনি বই লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন, পত্রিকা পরিচালনা করেছেন। সত্যাগ্রহ, অহিংস, অসহযোগ এসব তাঁরই

উদ্ভাবন; রামরাজ্যও তাই। কিন্তু তাঁর চিন্তা তাকে সামনের দিকে যেতে সাহায্য করেনি, তিনি চলে গেছেন পিছন দিকে। জিন্নাহ এবং মুজিব তেমন কিছু লিখেছেন বলে জানা যায় না। মুজিবভক্তরা যে মুজিববাদের অস্তিত্ব প্রচার করতো বাস্তবে তা কি বস্তু তা তারা নিজেরাই জানতো না।

গান্ধী ও জিন্নাহ তাদের শত্রু কে সেটা স্পষ্টভাবে জানতেন। গান্ধীর শত্রু ছিল উপনিবেশবাদী ইংরেজ; জিন্নাহ তাঁর শত্রু হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন গান্ধীর ভারতীয় কংগ্রেসকে। মুজিবের শত্রু ছিল নব্য-উপনবিশেবাদী পাকিস্তানি শাসকরা; সেই হিসেবে জিন্নাহর সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি মিত্রের নয়, শত্রুর বটে। কিন্তু মস্ত বড় বক্রাঘাত এখানে যে, গান্ধী এবং তাঁর শত্রু (ইংরেজ), জিন্নাহ্ এবং তাঁর শত্রু (গান্ধী), মুজিব এবং তাঁর শত্রু (জিন্নাহ) ভেতরে ভেতরে একই পথের পথিক ছিলেন। পথটা পুঁজিবাদী বিকাশের এবং সমাজবিপ্লবকে প্রতিহত করার। এর বাইরে গিয়ে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়, উন্নতি ঘটানো যায় দেশবাসীর, এ চিন্তা তাঁদের মনে আসেনি। এ প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, তাঁরা তিনজনই ছিলে পরাধীন দেশের মানুষ।

স্বাধীন বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীও ওই পুরাতন পথেই চলছে। তাদের শত্রু পুঁজিবাদ নয়, সাম্রাজ্যবাদীরাও নয়; তাদের শত্রু জনগণের সেই বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি যা সমাজবিপ্লবে বিশ্বাস করে। ওই বিকল্প শক্তির নেতৃত্ব পুরাতন পদ্ধতিতে ও পথে বিকশিত হবে না। তার পথ যেমন ভিন্ন হবে, পদ্ধতিকেও তেমনি নতুন হওয়ার প্রয়োজন পড়বে।

ড সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং কলামিস্ট ।